ফেদেরিকো ফেলিনি ও তাঁর ছবি "৮ ১/২"

রজত রায়

১০০ বছরের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে অল্প কয়েকজন চলচ্চিত্রকার তাঁদের অনন্য মৌলিকতা এবং একান্ত ব্যক্তিগত স্টাইলের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন ইতালির চলচ্চিত্রকার ফেদেরিকো ফেলিনি (১৯২১ - ১৯৯৩)। সিনেমা তৈরির ভঙ্গিতে তিনি এতই স্বতন্ত্র যে আগে থেকে না জানিয়ে তাঁর কোন ছবি প্রেক্ষাগৃহে মাত্র দুমিনিটের জন্য প্রক্ষেপণ করলেই দ্রুতবলে দেওয়া যায় যে ছবিটি নিশ্চয়ই ফেলিনির। ব্যক্তিগত স্টাইলের অসাধারণ মৌলিকতা না থাকলে এই জিনিস কোনমতেই সম্ভবপর হত না।

ইতালির সমুদ্রের ধারে ছোট একটি শহর রিমিনিতে তাঁর জন্ম। জন্মের এই মফস্বল শহরটি তাঁর অন্তত গোটা চারেক ছবিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। যখনই আত্মকথামূলক কোন ছবি করতে গেছেন তখনই ঘুরে ফিরে এসেছে এই ছোট্ট রিমিনি শহরের পরিবেশ, তার মানুষজন, তার গির্জা, তার বিদ্যালয়, তার দোকানদার,তার যুবক - যুবতী, বৃদ্ধ - বৃদ্ধা এমনকী বারাঙ্গনাদের কথাও। রিমিনিতেই পড়াশুনার পাঠ শেষ করে তিনি প্রথমে ফ্লোরেন্স (১৯৩৮-এ) এবং পরে রোমে এসে (১৯৩৯-এ) কর্মজীবন শু করেন। প্রথমে সাংবাদিক, কার্টুন শিল্পী, গীত-রচয়িতা ইত্যাদি খুচরো অনেক রকমেরকাজ করে অবশেষে চিত্রনাট্যের সহকারী লেখক হিসাবে নিজেকেপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে তাঁর প্রথম গুত্বপূর্ণ কাজ রোবের্তো রোসেলিনি পরিচালিত দুটি ছবি 'রোম, ওপেন্ সিটি' (১৯৪৫) এবং 'পাইসা'-র (১৯৪৭) চিত্রনাট্যের কাঠামো লিখে দেওয়া। তখন তিনি ইতালির নয়া বাস্তববাদী চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন এবং বেশ কয়েকবছর এই ধারার সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রাখলেন। রোসেলিনি ছাড়া নিও রিয়ালিস্ট সিনেমার আরও দুজন পরিচালকের হয়েও তিনি চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছেন এবং সহকারী পরিচালকের কাজও করেছেন।

স্বাধীন চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য হোয়াইট শেখ' (১৯৫২) একটি প্রহসনধর্মী ছবি। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই ছবির কাহিনী তিনি রচনা করেছিলেন। পরের বছরের ছবি 'আই ভিতেলোনি' (I Vitelloni / ১৯৫৩) তাঁর প্রথম আত্মজীবনীমূলক ছবি। এই ছবি থেকেই যে ধারা শু হয় তা চলে এসেছে তাঁর জীবনের একেবারে শেষ ছবি 'দ্য ইন্টারভিউ' (১৯৮৭) পর্যন্ত। এই ধারারই অন্য বিখ্যাত ছবিগুলি হল 'উল বিদোনে' (Il Bidone/ ১৯৫০), 'লা দোলচে, ভিতা' (La dolce Vita/ ১৯৬০), 'আমারকর্ড (Amarcord/ ১৯৭৩) এবং 'দ্য ইন্টারভিউ'। এই সবকটি ছবিতেই ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর ছোটবেলার শহর রিমিনির কথা। তাঁর বাবা-মা, দাদা, ঠাকুরদা, কাকা এবং ছোট্ট শহরের প্রত্যেকটি চবিত্রের 'স্মৃতি তাঁর মনে বার - বার ঘুরে ফিরে এসেছে। শৈশব এবং কৈশোরকে দেখেছেন তিনি এমন চমৎকারভাবে চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব ঢঙে প্রকাশ করেছেন যে তা গোটা পৃথিবীর রসিক ফিল্ম দর্শকদের একেবারে মাতোয়ারা করে দিয়েছে।

তাঁর স্ত্রী গুয়েলিয়েত্তা মাসিনা (Giulietta Masina) ছিলেন একজন অভিনেত্রী। কর্মসূত্রেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং বিবাহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি তিনটি বিখ্যাত ছবি তুলেছেন--'লা স্ট্রাডা' (La Strada/ ১৯৫৪), 'নাইটস্ অফ্ ক্যাবিরিয়া' (১৯৫৭) এবং ডালিয়েট অফ্ দ্য স্পিরিটস' (১৯৬৫)। এই মহিলাটির কৌতুকপ্রদ এভিনয়ের জন্য তাঁকে সেকালের দিনের 'মহিলা চ্যাপলিন' বলা হত মাসিন 'লা স্ট্রাডা' - তে অভিনয় করে ছিলেন এক দরিদ্র মেয়ের ভূমিকায় যাকে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় ছবি 'নাইটস্ অফ ক্যাবিরিয়া' - তে তিনি অভিনয় করেন এক বারাঙ্গনার চরিত্রে, যে ধর্ম এবং রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে দিয়ে মানুষের মুক্তির সন্ধান করে। 'জুলিয়েট অফ্ দ্য স্পিরিটস' এ তিনি এক মধ্যবয়সী স্বামী - পরিত্যক্তা স্ত্রী, যিনি বেঁচে থাকার জন্য অ্যাত্মিক শক্তির মধ্যেই নিজের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পান। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই নিক্ত রিয়ালিস্ট ফিল্ম মেকারদের সঙ্গে ফেলিনির ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 'লা স্ট্রাডা' ছবিটির ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণের জন্য সিজারে জাভাত্তিনি ফেলিনিকে তীব্র আত্রমণ করেন। এর প্রত্যুত্তরে ফেলিনি 'ইল বিদোনে' ছবিটি তুলে বলতে চান যে নয়াবাস্তববাদী ছবির আবেগের দিকগুলি তাঁর একদম ভালো লাগে না।

১৯৬০ -এ তোলা 'লা দোলচে ভিতা' তাঁর সম্পূর্ণ নতুন চিত্রভাষার জন্য এবং যুদ্ধোত্তর ইতালির ভেঙে - যাওয়া মূল্যবোধগুলো বাস্তব - স্বপ্ন - স্মৃতি এবং অসম্ভব কল্পনায় মিশিয়ে চিসম্মতভাবে তুলে ধরার জন্য স্বদেশে ও বিদেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা পায় এবংবেশ ভালোরকমের অর্থও উপার্জন করে। এই ছবিটিও ফেলিনির আত্মজীবনীমূলক ছবিগুলির একটি। এই ছবি তে এবং পরের ছবি ৮১/২ (১৯৬৩)-এ ফেলিনির নিজের আত্মিক সত্তা মূল কেন্দ্রীয় চরিত্রটি অভিনয় করেন মার্সেলো মাস্ত্রোয়ানি। ইতালি তথা ইউরোপের এই শক্তিশালী অভিনেতাটি ফেলিনিকে যতটা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারতেন তেমনটি বোধহয় আরকেউ পারতেন না। যার জন্য জীবনের শেষ

ছবিতেও ফেলিনি মাস্তোরইয়ানিকে ভুলে যেতে পারেননি।
আত্মজীবনীমূলক ছবির যে ধারা ফেলিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেটাই একেবারে তুঙ্গে উঠেছে '৮ ১/২' - এ। এই ছবির কাহিনী, তার বিন্যাস এতই ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব যে ফেলিনির মনোজগতকে ভালোভাবে অনুধাবন না করতে পারলে এই ছবির থেকে কোন মজা পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত ১৯৬৩ - তে ছবিটি যখন রোম শহরে প্রথম মুক্তি পায় সেই সময়কার কিছু কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রোমের যে হলে টানা তিনঘন্টার এই ছবিটি দেখানো হয়েছিল সেখানে যখন শো শেষ হল, তখন দর্শকরা বেরিয়ে আসতে আসতে যে সব স্বগতোক্তি করেছিলেন তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে তৎকালীন 'নিউজউইক' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। একজন দর্শক ছবিটি দেখে বেরিয়ে এসে বিড় বিড় করে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ছবিটা অবশেষে শেষ হল। আর কিছুক্ষণ ছবিটি চললে আমিনির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম। "দ্বিতীয় এক দর্শক মন্তব্য করেন, "সিডেটিভ কোনও ট্যাবলেট না খেয়ে এই ছবি দেখতে যাওয়া উচিত নয়।" আর সাংবাদিকেরা যখন ফেলিনির কাছে এই ছবিটির অদ্ভুত নামকরণের অর্থ জানতে চাইলেন তখন ফেলিনি উত্তরে জানালেন, অর্থটা তো খুবই সহজ। এর আগে তিনি আটটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলেছেন। বর্তমান ছবিটি আসলে তাঁর নবম ছবি। কিন্তু ছবিটি শেষ হওয়ার পর দেখা গেল পরিচালক হিসাবে এই ছবিতে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা পুরোপুরি বলতে পারেননি। ছবি অর্ধেকটা সফল, অর্ধেকটা ব্যর্থ। আর তাই - এর নাম '৮ ১/২'। এই কৌতুক এবং মজার দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে গোটা ছবিটি জুড়েই।
ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র গুইডো একজন চলচিত্র পরিচালক ফেলিনির নিজেরই আত্মিক সত্তা এই মানুষটি দিগ্‌ভ্রান্ত এবং দিশেহারা। নতুন ছবির কাজ শু করার জন্য তিনি কোনও প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং ফিল্ম নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষেরাই তাঁর নিষ্ক্রিয়তার জন্য অসন্তুষ্ট, এবং ক্ষুব্ধ। সবদিক থেকে কাজের চাপ আসতে থাকায় গুইডো তাঁর শৈশবের স্মৃতি এবং কল্পনার জগতে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চান। সৃজনশীল শিল্পীর জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিকে ফেলিনি আশর্চ্য সরলতার সঙ্গে উন্মোচন করে দেন। সমাজ এবং পরিবেশ একজন শিল্পীর জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলে তাও তিনি তুলে ধরেন অদ্ভুত কাল্পনিক কিছু ঘটনার মধ্যদিয়ে। এই ছবির দৃশ্যগত জটিলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির কাছে মূল আবেদন '৮ ১/২ ' - কে একটা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ছবিতে পরিণত করেছে। যদিও সাধারণ দর্শক এই ছবিতে কোন সহজ সরল ন্যারেটিভ না পেয়ে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলেন, সমালোচকদের চোখে কিন্তুএই ছবিটি অত্যন্ত মর্যাদা পায়। মুক্তির বছরই অর্থাৎ ১৯৬৩ -তে ছবিটি মস্কো আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পায়।

ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ চলচিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'সাইট অ্যান্ডসাউন্ড' ১৯৫২ সালে গোটা পৃথিবীর চলচিত্র সমালোচকদের কাছ থেকে ভোট নিয়ে শু থেকে সমকাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ দশটি ছবির একটি তালিকা প্রকাশ করা শু করে। দশ বৎসর ১৯৬২-তে আবার একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়। আরও দশ বছর বাদে ১৯৭২ সালে আবার নতুন করে সমালোচকদের মতামত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে এই দশকেই তোলা হয়েছে ফেলিনির '৮ ১/২'। ১৯৭২ সালে 'সাইট অ্যান্ড' যে শ্রেষ্ঠ দশটি ছবি তালিকা প্রকাশ করল তাতে দেখা গেল সমালোচকদের বিচারে পৃথিবীতে এযাবৎ নির্মিত শ্রেষ্ঠ ছবির মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে ফেদেরিকো ফেলিনির '৮ ১/২' । ১৯৮৩ - তে যখন নতুন করে সমালোচকদের মতামত নেওয়া হল তখন দেখা গেল নামের তালিকায় অন্যান্য ছবির অনেক বদল হলেও ' ৮ ১/২' এবারেও শ্রেষ্ঠ দশটির মধ্যেই রয়েছে। বোরেও বরণীয় ও স্মরণীয় হিসাবে তার স্থান চতুর্থ।
জার্মান সমালোচক এবং তাত্ত্বিক ত্রিশিস্টিয়ান মেজ্ চমৎকারভাবে লিখলেন-- '৮ ১ঙ্গ২ নব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ন্ত্রনপুপ্প প্সন্দ্র ৮ ১ঙ্গ২ ন্ধন্দ্বন্দ্ধ প্পস্তুন্দ্ব. সত্যিই' এটি হচ্ছে একটি ফিল্মের মধ্যে আরেকটি ফিল্ম। দ্বিধাগ্রস্ত পরিচালকের স্মৃতি, কল্পনা এবং বর্তমান সময় এই সবকিছু মিলে যে মনোজগতের সৃষ্টি করে তা দর্শককে বিনোদন ছেড়ে চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। আর এই কাজটি হয় আশর্চ্য গতিশীল এক চলচিত্র ভাষায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল চলমান ক্যামেরা, বিচিত্র চরিত্রের দৃষ্টিকে একটানা পর্দার দিকে ধরে রাখে। দৃশ্য দিয়ে ফেলিনি যা বলেন কোন কথা দিয়ে তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। সিনেমার ইতিহাসে এমন গতিশীল চিত্রকল্প খুব কম ছবিতেই পাওয়া যায়। গুইডোর মনোজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্যামেরা কখনও পাশে পাশে চলতে থাকে, কখনও সামনে এগিয়ে যায়, কখনও ওপরে তাকায় আবার কখনও সময়ের প্রবাহকে একেবারে তছনছ করে দেয়। অতীত ও বর্তমান, কল্পনা, ও বাস্তব, গুগম্ভীর বিষয় এবং লঘু আচরণ সব একত্রে মিলেমিশে গিয়ে একটা বিচিত্র স্বাদের সৃষ্টি করে। আশর্চ্য দ্রুততার সঙ্গে অথচ সাবলীলভাবে ঘটনার স্থান এবং কাল বদলে যায়-- আর তা সবই হয় কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিভিন্ন অনুভূতি এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতির জন্য। গোটা ছবিতে দর্শক সবকিছুকে ব্িেষণ করতে থাকেন গুইডোর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে - যার মধ্যে মিশে আছে স্বপ্ন, কল্পনা এবং স্মৃতি। দর্শককে নিয়ে তিনি মজা করেন, ঠিক যেমনটি করেন তিনি নিজেকে নিয়ে। এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন গুইডো কোনও প্রেরর উত্তর দিতে পারেন না। যে কোনও কারণেই হোক তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারেন না তাঁর চিত্রনাট্যটি কোন্ ধরনের হবে, চরিত্রগুলির আচরণ কী হবে, ছবিটি কোথা থেকে শু হবে আর কোথায় গিয়ে শেষ হবে। মাঝে মাঝে মনে হয় বিভ্রান্ত গুইডো তাঁর সমস্ত প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সহকর্মী এবং তাঁর আপনজনদের তিনি ভয় পান। তাঁদের তিনি এড়িয়ে চলতে চান। ঘটনা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যাকে রীতিমতো কমিক বলা চলে।
কমিক এবং বিভ্রান্তি মেশানো গুইডোকে আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। অনুভব করতে পারি যে গুইডো একটি আত্মিক সংকটের

মধ্যে দিয়ে চলেছেন। কিন্তু কেন তাঁর এই সংকট তার কারণ আমাদের কাছে রহস্যাবৃতই থেকে যায়। বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে পরিচালক কি তাঁর নিজের সৃজনশীল সত্তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, নাকি প্রস্তাবিত ছবির কাহিনী তাঁর পছন্দ হচ্ছে না, অভিনেতা - অভিনেত্রীদের মধ্যে থেকেও তিনি কাউকে ঠিক বেছে নিতে পারছেন না। আর যত তিনি অসহায় বোধ করছেন, তত ফিরে যাচ্ছেন শৈশবের জগতে, কল্পনার রাজ্য।

আত্মজীবনীমূলক ছবি '৮ ১/২' -ই প্রথম নয়, তার আগেও বেশ কয়েকজন পরিচালক এই ধরনের ছবি তুলেছেন। আবার দশ বছর ব াদে, ১৯৭৩ সালে, ফ্রাঁসোয়া ত্রফোও তুলছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক ছবি 'ডে ফর নাইট'। কিন্তু '৮ ১/২' -এ বিশ্লেষণ কৌতুক, অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে ফেলিনি যেভাবে খেলা করেছেন। সেরকমটি আর কোনও চিত্রনির্মাতাকে করতে দেখা যায়নি। ছবিতেসংকটের ছ ায়া থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত একটা কমিকের চেহারা নিয়ে নেয় এবং এই কমিকের মধ্য দিয়েই গুইডো তাঁর সংকট থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করেন। একবার দেখা যাচ্ছে তিনি ভয়, হতাশা এবং নিষ্ক্রিয়তায় ভারাক্রান্ত। লোকজনকে তিনি ভয় পান, সাংবাদিক বৈঠকে তিনি টেবিলের নীচে লুকিয়ে পড়েন, আবার দেখা যায় কিছুক্ষণ পরেই তিনি পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন এবং হাতে মাইক্রোফে ান নিয়ে শুটিং -এর দৃশ্য - পরিচালনা করতে থাকেন। কেবল গুইডোর নিজের কথায় বুঝতে পারে যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেতিনি যাদু এবং রহস্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে পেরেছেন। এই সামঞ্জস্য আনতে পাবার পরেই গুইডো তাঁর শক্তি ফিরে পান। সার্কাসের খেলোয়ার যেমন চাবুক হাতে নিয়ে জীবজন্তুদের নাচায় পরিচাল গুইডোও তেমনি হাতে মেগাফোন নিয়ে তাঁর চরিত্রদের পরিচালনা করেন, চরিত্রগুলি তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে নাচতে থাকে। গুইডোও তাঁর সাবলীলতা ফিরে পান। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও স্মৃতিজগৎ তঁ াকে আবার কর্মক্ষত্র করে তোলে।

বিচিত্র স্বাদের এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই ছবি দর্শককে যেমন নতুন এক অভিজ্ঞতা এনে দেয় তেমনই ফেলিনির আচরণে যে কোনও কৃত্রিমতা নেই তা বোঝা যায় তাঁর দশ বছর পরের ছবি 'আমারকড' (১৯৭৩ এবং জীবনের শেষ ছবি 'দ্য ইন্টারভিউ' (১৯৮৭) দেখলে।

নিও রিয়ালিজম্ দিয়ে যাত্রা শু করে আত্মবিশ্লেষণে সমাপ্তি -এর ভেতরে ফেলিনির কোন ভণ্ডামি অথবা অসৎ আচরণ নেই।

শতবর্ষের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ফেদেরিকো ফেলিনিকে মনে রাখবে এক অনন্য মৌলিক চলচ্চিত্রকার হিসাবে। মৃত্যুর বছরে,১৯৯৩ স ালে, তাঁকে তাঁর সারাজীবনের চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্য (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয়, ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে।